নিজেদের মূর্খতার দরুন মানবত্বকে নবুয়তের পরিপন্থী বলে মনে করত)। আর [এ অস্বীকৃতিতে তারা এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও নবুয়তের দাবি সম্পর্কে] বলতে লাগল, (অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে) এ ব্যক্তি যাদুকর এবং (নবুয়ত দাবির ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী। সে যখন বহু উপাস্যের জায়গায় এক উপাস্য করে দিয়েছে (কাজেই সে কি সত্যবাদী হতে পারে?)। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (তওহীদের বিষয়বস্তু শুনে) কতিপয় কাফির মোড়ল (মজলিস থেকে উঠে মানুষের কাছে) এ কথা বলে প্রস্থান করল যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় স্থির থাক। (কেননা প্রথমত তওহীদের) এ দাওয়াত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (বলে মনে হয়। অর্থাৎ এই বাহানায় সে রাজা হতে চায়। দ্বিতীয়ত তওহীদের দাবিও অবান্তর ও অভূতপূর্ব। কেননা) আমরা পূর্ববর্তী ধর্মে এমন কথা শুনিনি। এটা (এ ব্যক্তির) মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (পূর্ববর্তী ধর্মের অর্থ এই যে, দুনিয়াতে অনেক ধর্মাবলম্বী এসেছে। সবার শেষে আমরা এসেছি এবং আমরা সত্যপন্থী। এই পন্থাবলম্বী বড়দের কাছে আমরা কখনও এরূপ কথা শুনিনি। এ ব্যক্তি যে নবুয়ত দাবি করে এবং তওহীদকে আল্লাহ্র শিক্ষা বলে আখ্যা দেয় প্রথমত, তো নবুয়ত মানবত্বের পরিপন্থী, দ্বিতীয়ত, এদিকে লক্ষ্য না করলেও) আমাদের সবার মধ্যে তারই (শ্রেষ্ঠত্ব ছিল যে, সে-ই নবুয়ত পেয়েছে এবং তারই) প্রতি কি কোরআন অবতীর্ণ হল? (বরং তা যদি কোন সরদারের প্রতি অবতীর্ণ হত তাহলে কোন আপত্তি থাকত না। অতপর আল্লাহ্ বলেন, তাদের এই বক্তব্যের কারণ এই নয় যে, এমনটি হলে তারা অনুসরণ করত---) বরং (আসল কথা এই যে,) তারা আমার কোরআনের প্রতি সন্দেহে পতিত; (অর্থাৎ তারা কোন মানুষকে পয়গম্বর মানতে প্রস্তুত নয়। এটাও দলীলের ভিত্তিতে নয়) বরং (কারণ এই যে,) তারা এখনও আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করেনি। (আস্বাদন করলে বুদ্ধি-বিবেক ঠিক পথে এসে যেত। অতপর অন্যভাবে জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে,) না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত মহা দয়াবান প্রতিপালকের রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে (যাতে নবুয়তও দাখিল আছে। অর্থাৎ নবুয়তসহ রহমতের সকল ভাণ্ডার যদি তাদের করায়ত্ত থাকত তবেই তাদের একথা বলার অবকাশ থাকত যে, আমরা মানুষকে নবুয়ত দেইনি; সুতরাং সে কেমন করে নবী হয়ে গেল?) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর উপর তাদের সার্বভৌমত্ব আছে? (এরূপ সার্বভৌমত্ব থাকলেও তাদের একথা বলার অবকাশ ছিল যে, তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপযোগিতা সম্পর্কে অবগত। কাজেই তারা যাকে চায়, তারই নবুয়ত পাওয়া উচিত। অতপর অক্ষমতা প্রকাশার্থে বলা হচ্ছে যে, তাদের এরূপ সার্বভৌমত্ব) থাকলে তারা সিঁড়ি লাগিয়ে (আকাশে) আরোহণ করুক। (বলা বাহুল্য, তাদের এরূপ ক্ষমতা নেই। সুতরাং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর তাদের কি সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে? এমতাবস্থায় এরূপ ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলারও তাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু হে রসূল! আপনি তাদের বিরোধিতার কারণে চিন্তাযুক্ত হবেন না। কেননা) এখানে

(অর্থাৎ মক্কায় পয়গম্বর বিরোধীদের) বহু বাহিনীর মধ্যে তাদেরও একটি বাহিনী রয়েছে, যারা (শীঘ্রই) পরাজিত হবে। (বদর যুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে।) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, ফিরাউন যার (সাম্রাজ্যের) খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল, সামূদ, লূতের সম্প্রদায় এবং আইকার লোকেরা। (তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।) এরাই ছিল বিপুল বাহিনী (উপরে من الاحزاب বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে।) এরা সবাই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল (যেমন কোরায়শ কাফিররা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করছে।) ফলে আমার আযাব (তাদের উপর) পতিত হয়েছে। (সুতরাং অপরাধ যখন অভিন্ন, তখন আযাবও অভিন্নই হবে। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত কেন?) তারা (অর্থাৎ মিথ্যারোপ করতে বদ্ধপরিকর কাফিররা) কেবল একটি মহানাদের (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁকের) অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশও থাকবে না (অর্থাৎ কিয়ামত)। তারা (কিয়ামতের কথা শুনে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টার ছলে) বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, (পরকালে কাফিরদের যে আযাব হবে, তা থেকে) আমাদের প্রাপ্য অংশ আমাদেরকে হিসাব দিবসের পূর্বেই দিয়ে দিন। (উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত আসবে না। হলে আমরা এখনই আযাব চাই। আযাব যখন হয় না, তখন কিয়ামতও আসবে না। (নাউযুবিল্লা!)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূল: এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর পিতৃব্য আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা-শোনা ও হিফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরায়শ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবূ জহ্‌ল, আ'স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবূ তালিব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। তারা বলবে; আবূ তালিবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ (সা)-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালিব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই যাতে সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দেবদেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়।

আবূ তালিব রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেনঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কোরায়শ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কোরায়শের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবূ তালিব বললেনঃ সে বিষয়টা কি? তিনি বললেনঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার দৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবূ জহ্ল বলে উঠলঃ বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ ব্যস "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বললঃ আমরা কি সমস্ত দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই সূরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে কাসীর)

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ ---(তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল)---এতে উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ—এর শাব্দিক অর্থ "কীলকওয়ালা ফিরাউন"। এর তফসীরে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেনঃ এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (র) এর তরজমা করেছেন ---"যার খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেনঃ সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেনঃ সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেনঃ এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। ---(কুরতুবী)

مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ এটা أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (র) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায়ই ছিল আদ, সামূদ প্রমুখ। তাদের মুকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য।

তারাই যখন খোদায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে ?---(কুরতুবী)

مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ —আরবীতে فواق -এর একাধিক অর্থ হয়। এক. একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فواق বলা হয়। দুই সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।----(কুরতুবী)

عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا —আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলীল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি 'অংশ' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۱۷﴾ اِنَّا
سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿۱۸﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ
كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۱۹﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿۲۰﴾

---

(১৭) তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি পর্বত-মালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত; (১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন, সে (সবরসূচক ইবাদতে খুব) শক্তি (ও সাহসিকতা) সম্পন্ন ছিল। সে (আল্লাহ্‌র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (আমি তাকে অনেক নিয়ামত দান করেছিলাম। এক---) আমি পর্বতমালাকে হুকুম করেছিলাম যে, তার সাথে (শরীক হয়ে) সন্ধ্যায় ও সকালে [এটাই ছিল দাউদ (আ)-এর পবিত্রতা ঘোষণার সময়] পবিত্রতা ঘোষণা কর। আর (এমনিভাবে) পক্ষীকুলকেও (হুকুম করেছিলাম) যারা

(পবিত্রতা ঘোষণা করার সময়) তার কাছে সমবেত হত। এই পর্বতমালা ও পক্ষীকুল সবাই তার (পবিত্রতা ঘোষণার) কারণে যিকিরে মশগুল থাকত। (দ্বিতীয় নিয়ামত ছিল এই যে,) আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। (তৃতীয় নিয়ামত ছিল যে,) আমি তাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ নবুয়ত) ও ফয়সালাকারী (সুস্পষ্ট ও সারগর্ভ) বাগ্মীতা দান করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ—(স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী।) প্রায় সমস্ত তফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দাউদ (আ) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। اِنَّهٗ اَوَّابٌ (নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।) বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায ছিল দাউদ (আ)-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ (আ) আল্লাহ্র দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

ইবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোযায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু এক দিন পর পর রোযা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ—এ আয়াতে দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বত-মালা ও পক্ষীকুলের ইবাদতে ও তসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য

বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ পাঠকে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হত?

এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ (আ)-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, মু'জিযা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী (র) এর এক সূক্ষ্ম জওয়াবে বলেনঃ পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্র ফলে যিকিরের এক বিশেষ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে ইবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্ঘবদ্ধ যিকিরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সূফী বুযুর্গগণের মধ্যে যিকিরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে যিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ যিকির করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়।
---(মাসায়েলে সুলুক)

চাশ্তের নামায ঃ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ — যোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عشى বলা হয়। আর اشراق এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এই আয়াতকে চাশ্তের নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। চাশ্তের নামাযকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবর্তীতে "সালাতে আওয়াবীন" নাম মাগরিবের পরে ছয় রাক'আতের জন্য এবং 'সালাতে ইশরাক' নাম সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাক'আত নফল নামাযের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশ্তের নামায দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত যত রাক'আত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবূ হোরায়রা রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাশ্তের দুই রাক'আত নামায নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ্ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাশতের বার রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করে দেবেন।---(কুরতুবী)

আলিমগণ বলেন ঃ চাশ্তের নামাযে দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাক'আত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্য কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাক'আত হওয়াই শ্রেয়। কেননা চার রাক'আত পড়াই রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও নিয়ম ছিল।

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ — (আমি তাকে হিকমত ও ফয়সালা-কারী বাগ্মিতা দান করেছি।) হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধিরূপী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুয়ত। فصل الخطاب — এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। হযরত দাউদ (আ) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর اما بعد শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থই একত্রিত থাকতে পারে।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ
مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ
لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

(২১) আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে আমার

ভাই, সে নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলেঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। (২৪) দাউদ বললঃ সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে [যারা দাউদ (আ)-এর কাছে মোকাদ্দমা পেশ করেছিল] যখন তারা [দাউদ (আ)-এর] ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে (তাঁর কাছে) পৌঁছেছিল। (কেননা, সে সময়টি ছিল ইবাদতের। মোকদ্দমার বিচারের সময় ছিল না বিধায় পাহারাদাররা তাদেরকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি।) তিনি (তাদের এই নিয়ম বিরুদ্ধ আগমনের কারণে) সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। (কে জানে এরা হত্যার অভিপ্রায়ে এভাবে নির্জন কক্ষে প্রবেশ করল কি না?) তারা (তাঁকে) বলল ঃ আপনি ভীত হবেন না। আমরা বিবদমান দু'টি পক্ষ। একে অপরের প্রতি (কিছু) বাড়াবাড়ি করেছি। (এর মীমাংসার জন্যই আমরা এসেছি। পাহারাদাররা দরজা দিয়ে আসতে দেয়নি বলে আমরা এভাবে আসতে বাধ্য হয়েছি।) অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়সংগত মীমাংসা করুন; অবিচার করবেন না। আমাদেরকে (এ বিষয়ে) সরল পথ প্রদর্শন করুন। অতপর এক ব্যক্তি বলল ঃ (অভিযোগ এই যে,) এ লোকটি আমার ভাই (অর্থাৎ ধর্মীয় ভাই। দুররে মনসূরে হযরত ইবনে মাসউদ থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে।) তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে আর আমার আছে (সর্বমোট) একটি মাত্র মাদী দুম্বা। তবুও সে বলে ঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। কথাবার্তায় সে আমার প্রতি বল প্রয়োগ করে (এবং মুখের জোরে আমার কথা অগ্রাহ্য করে।) দাউদ বললেন ঃ সে তোমার দুম্বাকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি বাস্তবিকই অন্যায় করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি (এমনি) অন্যায় করে থাকে; তবে যারা ঈমানদার এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। অবশ্য তাদের সংখ্যা স্বল্পই। (একথাটি তিনি মযলুমের সান্ত্বনার জন্য বললেন।) দাউদ (আ) মনে করলেন, (এ মোকাদ্দমাটি এভাবে উত্থাপন করে) আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর তার পালনকর্তার সামনে তওবা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) রুজু হলেন। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম সে বিষয়ে আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও শুভ পরিণতি (অর্থাৎ জান্নাত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইবাদতখানায় বিবদমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন এক বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ (আ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আ) সব ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করতেন এবং কোন সময় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাউদ (আ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গম্বরের এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেন নি। তাই আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেয ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে— أبهموا ما أبهم الله — অর্থাৎ আল্লাহ্ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলা বাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তীদের উক্তির আলোকে এ পরীক্ষা ও যাচাইর বিষয়টি নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে খ্যাত একটি রেওয়ায়েত এই যে, হযরত দাউদ (আ)-এর দৃষ্টি একবার তাঁর সেনাধ্যক্ষ উরিয়ার পত্নীর উপর পড়ে গেলে তাঁর মনে তাকে বিয়ে করার স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এক ভয়ানক বিপজ্জনক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে দাউদ (আ) তার পত্নীকে বিয়ে করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে মানবাকৃতিতে বাদী-বিবাদীরূপে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, যা ইহুদীদের প্রভাবাধীন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতটি বাইবেলের

সামুয়েল কিতাবের একাদশ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত। পার্থক্য এতটুকু যে, বাইবেলে খোলাখুলি হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি উরিয়ার পত্নীর সাথে বিয়ের পূর্বেই ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ তফসীরী রেওয়ায়েতসমূহে ব্যভিচারের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, কেউ এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েতটি দেখে এ থেকে ব্যভিচারের কাহিনী বাদ দিয়ে একে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জুড়ে দিয়েছে। অথচ সামুয়েল কিতাবটিই মূলত ভিত্তিহীন। সুতরাং রেওয়ায়েতটি নিশ্চিত-রূপেই মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ একে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফেয ইবনে কাসীরই নয়, আল্লামা ইবনে জওযী, কাযী আবূ সউদ, কাযী বায়যাভী, কাযী আয়ায, ইমাম রাযী, আল্লামা আবূ হাইয়্যান আন্দালুসী, খাযেন, যমখশরী, ইবনে হযম, আল্লামা খাফফাজী, আহমদ ইবনে নসর, আবূ তামাম, আল্লামা আলুসী (র) প্রমুখ খ্যাতনামা তফসীরবিদ রেওয়ায়েতটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। হাফেয ইবনে কাসীর লিখেনঃ

কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার বেশির ভাগই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। রসূলে করীম (সা) থেকে এ সম্পর্কে অনুসরণীয় কোন কিছু প্রমাণিত নেই। কেবল ইবনে আবী হাতেম এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদও বিশুদ্ধ নয়।

মোটকথা, অনেক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর থেকে উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। এসব যুক্তি-প্রমাণের কিছু বিবরণ ইমাম রাযীর তফসীরে কবীর এবং জওযীর যাদুল মাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে উল্টা শাস্তি দিত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন।

হযরত দাউদ (আ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জালিমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।— (বয়ানুল কোরআন)

কোন কোন তফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। দাউদ (আ) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত সম্মানিত পয়গম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না; এ কারণেই তিনি পরে হুঁশিয়ার হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।---(রূহুল মা'আনী)

কেউ কেউ বলেনঃ হযরত দাউদ (আ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর গৃহের কোন না কোন ব্যক্তি ইবাদত, যিকির ও তসবীহে মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেনঃ হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, যিকির ও তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ্ বললেনঃ দাউদ, এটা আমার দেওয়া তওফীকের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নাই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির পর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। দাউদ (আ)-এর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচী বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে মশগুল হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন ইবাদত ও যিকিরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আ) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্র কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। ---(আহকামুল কোরআন)।

উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকাদ্দমাটি কাল্পনিক নয়---সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আ)-এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তফসীরবিদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয়---ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন যাতে দাউদ (আ) নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

সেমতে তাঁদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পত্নীকে বিয়ে করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তখন কাউকে "তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও"---এ কথাটি বলা দূষণীয় ছিল না। বরং তখন এ ধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। এর ভিত্তিতেই দাউদ (আ) উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা

দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেনঃ ব্যাপারটি এই যে, উরিয়া কোন এক মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। দাউদ (আ)-ও সে মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে দাউদ (আ)-এর ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কাযী আবূ ইয়া'লা এ ব্যাখ্যার প্রমাণস্বরূপ কোরআন পাকের وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ বাক্যটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাক্যটি প্রমাণ করে যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গামের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং দাউদ (আ)-তখনও তাকে বিয়ে করেন নি।---(যাদুল মাসীর)

অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের কোন কোন উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। (রূহুল মা'আনী, তফসীরে আবূ সউদ, যাদুল মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি।) কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কোরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য নয়। তাই এতটুকু বিষয় তো মীমাংসিত যে, উরিয়াকে হত্যা করানোর যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত। কিন্তু আসল ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু এগুলোর কোন একটিকেও অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। সুতরাং হাফেয ইবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্ঝঞ্ঝাট। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের আনুমান ও ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের কোন কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অস্পষ্টতার মধ্যেও অবশ্যই কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং কেবল কোরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখা এবং বিশদ বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মগত উপকারিতা অর্জিত হয়। এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ্ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাবে।

إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ —(যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করল।) محراب আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা কোন গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কোরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারের মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে ছিল না।---(রূহুল মা'আনী)

فَفَزِعَ مِنْهُمْ —[হযরত দাউদ (আ) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।]

ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণত মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই মন্দ। কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে—وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আ) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশংকায় হয়ে থাকে। আরবীতে একে خَوْف বলা হয়। দ্বিতীয় ভয় কোন মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবীতে একে خَشْيَة বলা হয়। (মুফরাদাতে রাগিব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ্ ব্যতীত কারও জন্য হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিতঃ قَالُوا لَا تَخَفْ —(তারা বললঃ আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং দাউদ (আ) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু দাউদ (আ) আসল ব্যাপার জানার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবত এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَلَا تُشْطِطْ (এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যত ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমত প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতপর এসেই দাউদ (আ)-এর মত মহান পয়গম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওয়া—এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু দাউদ (আ) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেন নি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিতঃ এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তার

ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবি। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।—(রূহুল মা'আনী)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ — [দাউদ (আ) বললেনঃ সে তোমার দুম্বীকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে]। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—(১) হযরত দাউদ (আ) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন——বিবাদীর বিবৃতি শুনেন নি। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। দাউদ (আ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতী মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই দাউদ (আ) বিচারকের পদমর্যাদায় নয়—মুফতীর পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতীর কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং, প্রশ্ন মুতাবিক জওয়াব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান-খয়রাত চাওয়া লুণ্ঠনের নামান্তরঃ এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ) কেবল এক ব্যক্তির দুম্বা দাবি করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যত কারও কাছে কোন বস্তু প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুণ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কোন কিছু চায় যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রার্থিত বস্তু দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তবে এভাবে উপঢৌকন চাওয়াও লুণ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায়, সে ক্ষমতাসীন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের দরুন দিতে অস্বীকার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপঢৌকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠন হয়ে থাকে। যে চায়, তার পক্ষে এভাবে অর্জিত বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরী, যারা মক্তব-মাদ্রাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদায় করে। একমাত্র সে চাঁদাই হালাল, যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুশিতে দান করে। যদি চাঁদা আদায়কারীরা তাদের ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা একযোগে আট-দশ ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে চাঁদা আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে। রসূলে করীম

(সা) পরিষ্কার বলেন ঃ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه — কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল তার মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়।

কাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন ঃ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ —(শরীকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি কোন কাজ-কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। কোন সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ —(দাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আ)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকলেও উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্য বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্য দাউদ (আ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ (আ)-এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বোঝতে পারত। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। দাউদ (আ)-ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ্ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসল এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে যায়।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ —(অতপর তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন।) এখানে 'রুকূ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এতে এখানে সিজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলিমগণের মতে এ আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয়।

রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয়ঃ ইমাম আবূ হানীফা এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে যদি রুকূতেই সিজদার নিয়ত করা হয়, তবে সিজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদার জন্য 'রুকূ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, রুকূও সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতিপয় জরুরী মাস'আলা স্মরণ রাখা দরকারঃ

(১) নামাযের ফরয রুকূর মাধ্যমে সিজদা তখনই আদায় হতে পারে, যখন সিজদার আয়াত নামাযে পাঠ করা হয়। নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করলে রুকূর মাধ্যমে সিজদা আদায় হয় না। কারণ, রুকূ কেবল নামাযেই ইবাদত—নামাযের বাইরে সিদ্ধ নয়। (২) রুকূর মধ্যে সিজদা তখন আদায় হবে, যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দু'তিন আয়াত তিলাওয়াত করার পরে রুকূ করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করার পরে রুকূতে গেলে সিজদা আদায় হবে না। (৩) তিলাওয়াতের সিজদা রুকূতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে রুকূতে যাওয়ার সময় সিজদার নিয়ত করতে হবে। নতুবা সিজদা আদায় হবে না। অবশ্য সিজদায় যাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। (৪) তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের ফরয রুকূতে আদায় করার পরিবর্তে নামাযে আলাদা সিজদা করাই সর্বোত্তম। সিজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত তিলাওয়াত করার পর রুকূতে যেতে হবে।—(বাদায়ে)

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ —(নিশ্চয় দাউদের জন্য আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকূর পর আল্লাহ্র সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজনঃ এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আ)-এর বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হল? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের" কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

(২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, একারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে শাসক করেছি। অতএব (এ পর্যন্ত যেমন করেছ, তেমনি ভবিষ্যতেও) মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করতে থেকো এবং (এ পর্যন্ত যেমন রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করনি, তেমনি ভবিষ্যতেও) রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ো না। (এরূপ করলে) এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত দাউদ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাযও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শাসনকার্যের জন্য তাঁকে একটি বুনিয়াদী পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশনামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, ২. সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, ৩. এ কর্তব্য পালনের জন্য নফসানী খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা-পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্যঃ এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদিতে ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। তাই সে শাসনকার্যের জন্য সে সব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বযুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কঃ সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে---এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি যা কোন কালেই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসক-বর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা সম্ভব। কোন যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছিল। খোলফায়ে-রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল-মু'মিনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালন করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল-মু'মিনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে'খেয়াল-খুশির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশির দুরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্র-পথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশির উপস্থিতিতে কোন উৎকৃষ্টতর আইন-ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্রঃ এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

(২৭) আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা। অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, জাহান্নাম। (২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেব? না আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব। (২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করিনি; (বরং এ সৃষ্টির ভেতরে অনেক তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ তাৎপর্য হল এগুলোর মাধ্যমে তওহীদ ও পরকাল প্রমাণিত হওয়া।) এটা (অর্থাৎ সৃষ্টিকে তাৎপর্যহীন মনে করা) তাদেরই ধারণা, যারা কাফির। (কেননা, তারা তওহীদ ও পরকাল অস্বীকার করার মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির সর্ববৃহৎ তাৎপর্যকেও অস্বীকার করে।) অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে (পরকালে) দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম। (কেননা, তারা তওহীদ অস্বীকার করত। তারা কিয়ামত অস্বীকার করে, অথচ কিয়ামতের তাৎপর্য হল সৎকর্মীদেরকে পুরস্কার এবং দুষ্কৃতকারীদেরকে শাস্তি দান! এখন তাদের কিয়ামত অস্বীকারের কারণে জরুরী হয়ে পড়ে যে, রহস্য বাস্তবায়িত না হোক, বরং সব সমান হয়ে যাক।) অতএব আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে তাদের সমতুল্য করে দেব,

যারা (কুফর ইত্যাদি করে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে? না (শব্দান্তরে) আমি আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? (অর্থাৎ এরূপ হতে পারে না। সুতরাং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎকর্মীরা পুরস্কার এবং দুষ্কর্মীরা শাস্তি পাবে। এমনিভাবে তওহীদ ও পরকালের সাথে রিসালতে ঈমান রাখাও জরুরী। কেননা,) এটা (অর্থাৎ কোরআন) এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে (অর্থাৎ এর অলৌকিকতা ও মহোপকারী বিষয়বস্তু অনুবাধন করে।) এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ তদনুযায়ী আমল করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষত পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাযী বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাবশত কোন বিষয় বোঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়-বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্য এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনার পূর্বে কাফিরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ (তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।) এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আ)-এর ঘটনা এ কথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অননুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শাস্তি দিতে বলে, সে কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারী-দেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কিয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে,

এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ জীবন-যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا ـ ـ ـ ـ كَالْفُجَّارِ — (আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মী-দেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহিযগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলীর ক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফিররা মু'মিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফিরের পার্থিব অধিকার মু'মিনের সমান হতে পারে না, বরং কাফিরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে। সেমতে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ
بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

---

(৩০) আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩১) যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল, (৩২) তখন সে বলল ঃ আমি তো আমার পরওয়ারদিগারের স্মরণ বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি—এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি দাউদ (আ)-কে পুত্র সুলায়মান (আ) দান করেছি। সে ছিল উত্তম বান্দা; (আল্লাহ্র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (কাজেই তার সে কাহিনী স্মরণীয়,) যখন (কোন এক) অপরাহ্নে তার সামনে উৎকৃষ্ট (জাতের) অশ্বরাজি (যা জিহাদের উদ্দেশ্যে রাখা হত) উপস্থিত করা হল, (আর সেগুলো পরিদর্শনে এত বিলম্ব হয়ে গেল যে, দিন শেষ হয়ে গেল এবং নামায জাতীয় কোন একটি নিয়মিত

ইবাদত ব্যাহত হয়ে গেল। তাঁর ভীতি ও প্রতাপের কারণে কোন কর্মচারীও তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করতে সাহস পেল না। অবশেষে যখন নিজেই টের পেলেন,) তখন তিনি বললেনঃ আমি আমার পরওয়ারদিগারের স্মরণ (অর্থাৎ নামায) বিস্মৃত হয়ে এই সম্পদের মহব্বতে মগ্ন হয়ে পড়েছি; এমনকি সূর্য আড়ালে (অর্থাৎ অস্তাচলে) অস্তমিত হয়ে গেছে। (অতপর কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেনঃ) অশ্বরাজিকে আবার আমার সামনে আন। (আদেশ মত আনা হলে) তিনি (তরবারি দ্বারা) সেগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করলেন। (অর্থাৎ যবেহ্ করে ফেললেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণ তাই, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ) অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ্ করে দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহ্র স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, পয়গম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয নামায হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ্ হয় না। কিন্তু সুলায়মান (আ) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে-কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলিমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত রসূলে করীম (সা)-এর এক উক্তি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্তিটি নিম্নরূপঃ

عن ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله فطفق مسحا بالسوق والاعناق قال تطع سوقها و اعناقها بالسيف -

আল্লামা সুয়ূতীর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা হুসায়মী (র) মজমাউয্ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেনঃ

"তিবরানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে বশীর রয়েছেন যাকে শো'বা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।"

এ হাদীসের কারণে বর্ণিত তফসীরটি খুব মজবুত। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু তফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন

যে, এ অশ্বরাজি সুলায়মান (আ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরীয়তে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কোরবানী করলে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে। (রূহুল মা'আনী)

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিহাদের জন্য তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেনঃ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই, কারণ এগুলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেনঃ এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

এই তফসীর অনুযায়ী عَنْ ذِكْرِ رَبِّي বাক্য عن কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تَوَارَتْ-এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে مسح-এর অর্থ কর্তন করা নয়। বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে-জরীর, তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কোরআন পাকের ভাষাদৃষ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনীঃ কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলম্বন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে رُدُّوهَا عَلَيَّ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু আল্লামা আলূসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন ঃ رُدُّوهَا عَلَيَّ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে—সূর্য নয়।

এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'অলার নাই; বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য নয়।---(রূহুল মা'আনী)

আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদা-বোধের দাবিঃ সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েয। সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়।---(বয়ানুল কোরআন)

কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হযুরে আকরাম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ জুহায়ম (রা) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবূ জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।---(আহকামুল কোরআন)

এমনিভাবে হযরত আবূ তালহা (রা) একবার তাঁর বাগানে নামাযরত অবস্থায় একটি পাখীকে দেখায় মশগুল হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েয নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (র) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসাবে তাঁর বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শে'রানী (র)-র মত অনুসন্ধানী সূফী বুযুর্গগণ তার এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেন নি।---(রূহুল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিতঃ এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগ-সমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদতে মশগুল থাকা ভুলঃ এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলা বাহুল্য, জিহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ

ইবাদতের পরিবর্তে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আ) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ লিখেন ঃ জুম'আর আযানের পর যেমন ক্রয়বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েয নয়, তেমনি জুম'আর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তিলাওয়াতে-কোরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

(৩৪) আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতপর সে রুজু হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সোলায়মান (আ)-কে (অন্য এক উপায়েও) পরীক্ষা করলাম এবং তার সিংহাসনের উপর রেখে দিলাম একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতপর তিনি (আল্লাহ্‌র দিকে) রুজু হলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্প্রাণ দেহ সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্প্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে কোন ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে আরও বেশি রুজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ)-এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহ্ রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আ) সে আংটি

একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তফসীরগ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর এ ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন ঃ

"আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আ)-কে পয়গম্বর বলেই মানে না। বাহ্যত এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলা কিছুতেই জায়েয নয়।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই ঃ একবার হযরত সোলায়মান (আ) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্ম-গ্রহণ করবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গম্বরের এ ত্রুটি আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিলেন। ফলে সকল বিবির মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববিহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন ঃ সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সোলায়মান (আ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সোলায়মান (আ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আলুসী প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ তফসীরবিদও এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনেও তদনুরূপ তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তফসীর বলা যায় না। কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আম্বিয়া, কিতাবুল আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরীকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুত্ তফসীরে সূরা ছোয়াদের তফসীর প্রসংগে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبْ لِي مُلْكًا আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোন বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর নয়; বরং রসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও

অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন আয়াতের তফসীর হওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় এক তফসীর ইমাম রাযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলায়মান (আ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন একটি নিষ্প্রাণ দেহ সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তফসীরও অনুমানভিত্তিক। কোরআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোন রেওয়ায়েতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্য আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন।

কোরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও সোলায়মান (আ)-এর মত আল্লাহ্র দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুত সোলায়মান (আ)-এর পরীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলার উপর সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

(৩৫) সোলায়মান বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। (৩৭) আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮) এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃংখলে। (৩৯)

এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও—এর কোন হিসাব দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্য আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হযরত সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র কাছে] দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার (বিগত) ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং (ভবিষ্যতের জন্য) আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন, যা আমাকে ছাড়া (আমার আমলে) কেউ পেতে পারবে না (কোন অদৃশ্য সাজসরঞ্জাম দান করুন, অথবা আমার সমসাময়িক রাজন্যবর্গকে এমনিতেই পরাভূত করে দিন, যাতে কেউ আমার মুকাবিলা করতে সমর্থ না হয়)। আপনি মহাদাতা (এ দোয়া কবুল করা আপনার জন্য কঠিন নয়)। তখন (আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম। এছাড়া) আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তাঁর হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে যেতে চাইত (ফলে অশ্বরাজির প্রয়োজন থাকেনি)। জিনদেরকেও তাঁর অধীন করে দিলাম অর্থাৎ প্রাসাদ নির্মাণকারীদেরকে এবং (মণিমুক্তা আহরণের জন্য) ডুবুরীদেরকে এবং অন্য আরও অনেক জিনকে যারা শৃংখলে আবদ্ধ থাকত। (সম্ভবত অর্পিত দায়িত্ব পালন না করা অথবা তাতে ত্রুটি করার কারণে তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ শৃংখলিত করা হত। এসব সাজসরঞ্জাম দান করে আমি বললাম ঃ) এগুলো আমার দান। অতএব এগুলো কাউকে দাও অথবা না দাও, এজন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। (অর্থাৎ আমি তোমাকে যেসব সাজসরঞ্জাম দিলাম, এতে অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেবল কোষাধ্যক্ষে ও ব্যবস্থাপকই নিযুক্ত করিনি, বরং তোমাকে মালিকও করে দিলাম। দুনিয়াতে প্রদত্ত এসব সাজসরঞ্জাম ছাড়াও) তাঁর জন্য আমার কাছে রয়েছে (বিশেষ) নৈকট্য ও (উচ্চ পর্যায়ের) শুভ পরিণতি (যার ফলাফল পূর্ণরূপে পরকালে প্রকাশ পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ —(আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না।) কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাঁদের মতে 'আমার পরে' শব্দটির অর্থ 'আমাকে ছাড়া'। হযরত থানভীও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায়। হযরত সুলায়মান (আ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালেও কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি।

কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত সুলায়মান (আ)-এর জিন বশীভূতকরণের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়; কিন্তু সোলায়মান (আ) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া ঃ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গম্বরগণের কোন দোয়া আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সোলায়মান (আ) এ দোয়াটিও আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সোলায়মান (আ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তাঁর অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাঁকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবূলও করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্য রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ।---(রূহুল মা'আনী)

مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ---(শৃংখলিত অবস্থায়---) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে সোলায়মান (আ) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরী নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্য অন্য কোন পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্য এখানে শিকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

(৪১) স্মরণ করুণ আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল: শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে পৌঁছিয়েছে। (৪২) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরনা নির্গত হল গোসল করার জন্য শীতল ও পান করার জন্য। (৪৩) আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ-শলা নাও, তা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি আমার বান্দা আইয়্যুব (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন সে তার পালন-কর্তাকে আহবান করে বলল: শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। [এই যন্ত্রণা ও কষ্ট কি ছিল, এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়্যুব (আ)-এর অসুস্থতার সময় শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইউব (আ)-এর পত্নীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। তিনি তাকে চিকিৎসক মনে করে চিকিৎসা করতে অনুরোধ করলেন। সে বলল: এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে এ কথা বলতে হবে: "তুমি তাকে আরোগ্য দান করেছ।" এ উক্তি ছাড়া আমি অন্য কিছু নজরানা চাই না। পত্নী আইয়্যুব (আ)-কে এ কথা জানালে তিনি বললেন, হায়রে তোমার সরলতা, সে তো শয়তান ছিল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে তোমাকে একশ' বেত্রাঘাত করব। এ ঘটনা থেকে আইয়্যুব (আ) ভীষণ কষ্ট পেলেন। তাঁর অসুস্থতার সুযোগে শয়তানের এতদূর দুঃসাহস হয়েছে যে, বিশেষ করে তাঁর পত্নীর মুখ দিয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করাতে চেয়েছে, যা বাহ্যত শিরকের কারণ। হযরত আইউব (আ) রোগ দূরীকরণের জন্য পূর্বেও দোয়া করেছিলেন; কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি আরও বেশি কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করলেন। সুতরাং আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং আদেশ দিলাম:] তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (বস্তুত আঘাত করার পর) সেখানে একটি ঝরনা সৃষ্টি হয়ে গেল। (অতপর আমি তাকে বললাম:) এটা (তোমার জন্য) গোসলের ও পান করার শীতল পানি। (অর্থাৎ এ থেকে গোসল কর এবং পান কর। গোসল ও পান করার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল) আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের মত (গণনায়) আরও অনেক (দিলাম) আমার বিশেষ রহমতের কারণে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণে। [অর্থাৎ বুদ্ধিমানরা স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবরকারীদেরকে কিরূপ প্রতিদান দেন। অতপর আইয়্যুব (আ) প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার ইচ্ছা করলেন। যেহেতু তাঁর পত্নী অসুস্থ অবস্থায় তাঁর অসাধারণ সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন এবং কোন গোনাহেও জড়িত ছিলেন না, তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমতে তাঁর শাস্তি হাল্কা করে দিলেন এবং বললেন:

হে আইউব,] তুমি তোমার হাতে একমুঠো চিকন শলা নাও (যাতে একশ' শলা থাকবে) অতপর তা দ্বারা আঘাত কর এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না। [সেমতে তাই করা হল। অতপর আইয়্যুব (আ)-এর প্রশংসা করা হচ্ছে---] নিশ্চয় আমি তাকে (খুব) সবরকারী পেয়েছি। সে ছিল বড়ই ভাল, (আল্লাহ্‌র দিকে) বড়ই প্রত্যাবর্তনশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূলে করীম (সা)-কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে আইয়্যুব (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে ঃ

مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ — (শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে।)

এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হযরত আইউব (আ) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ আইয়্যুব (আ)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল ঃ আমাকে তার দেহ, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যদ্দ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল আইউব (আ)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেওয়া হল। অতপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন ঃ কোরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইউব (আ)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলেন, রুগ্নাবস্থায় শয়তান হযরত আইয়্যুব (আ)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে তফসীরের সার সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়্যুব (আ)-এর রোগ কি ছিল? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইউব (আ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এর কোন বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোন কোন সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাঙ্গে ফোড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মত কোন রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়্যুব (আ)-এর রোগও এমন হতে পারে না; বরং এটা কোন

সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়।—(রূহুল মা'আনী, আহ্‌কামুল কোরআন থেকে সংক্ষেপিত)

خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا—(তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও।) এ ঘটনার পটভূমিকা তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসে গেছে। এখানে এ সম্পর্কে কয়েকটি মাস'আলা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম এই যে, এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একশ' বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ' বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরি করে নিয়ে তদ্দ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়্যুব (আ)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন যে, এর জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে—১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে লাগতে হবে এবং ২. এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী বয়ানুল কোর-আনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত তাই। নতুবা হানাফী ফকীহ্‌গণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়।—(ফতহুল কাদীর)

শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশলঃ দ্বিতীয় মাস'আলা এই যে, কোন অসমীচীন অথবা মকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীয়তসম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। বলা বাহুল্য, হযরত আইয়্যুব (আ)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবি এই যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ' বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আইয়্যুব (আ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েয, যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূল প্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্য হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েয। উদাহরণত যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধনসম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এরূপ কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয়তো যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।—(রূহুল মা'আনী)

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা ঃ তৃতীয় মাস'আলা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন অসমীচীন, ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। যদি কাফ্ফারা ওয়াজিব না হত, তবে আইয়্যুব (আ)-কে কৌশল শিখানো হত না। এতদসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফ্ফারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফ্ফারা আদায় করা।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ اِنَّآ
اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ
الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هٰذَا
ذِكْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ
الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ
قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ اِنَّ
هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هٰذَا ۭ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ
يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ
شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا
النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۭ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۭ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ
الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾
وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ
سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

(৪৫) স্মরণ করুন হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। (৪৬) আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। (৪৭) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎ-লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮) স্মরণ করুন ইসমাঈল, আল ইয়াসা' ও যুলকি ফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। (৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা—(৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়। (৫২) তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। (৫৩) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। (৫৪) এটা আমার দেওয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (৫৫) এটা তো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা (৫৬) তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল। (৫৭) এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। (৫৮) এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৫৯) এইতো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। অতএব এটি কতই না ঘৃণ্য আবাসস্থল। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। (৬২) তারা আরও বলবে, আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না! (৬৩) আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (৬৪) এটা অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে স্মরণ করুন, যারা হাত বিশিষ্ট (অর্থাৎ হাতে কাজ করতেন ও) চোখ বিশিষ্ট ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি উভয়ই ছিল।) আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। (বলা বাহুল্য, পয়গম্বরগণের মধ্যে এ গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এ বাক্যটি সংযুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, গাফিলরা বুঝুক, পয়গম্বরগণ যখন এ চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন না, তখন আমরা কোন্ কাতারে আছি?) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ মনোনীতদের মধ্যেও সর্বোত্তম। সেমতে পয়গম্বরগণ অন্যান্য ওলী ও সৎকর্মী-গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন।) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, যুলকিফলকেও স্মরণ করুন। তাদের সবাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (অতপর তওহীদ, পরকাল ও রিসালতের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।) এক উপদেশ তো এই হল। (অর্থাৎ

পয়গম্বরগণের ঘটনাবলীর মধ্যে কাফিরদের উদ্দেশ্যে রিসালতের প্রচার এবং মু'মিনদের জন্য উত্তম চরিত্র ও উত্তম কর্মের শিক্ষা। পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিষয় এই যে,) আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য (পরকালে) রয়েছে উত্তম ঠিকানা তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (অর্থাৎ পূর্ব থেকেই উন্মুক্ত থাকবে।) তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে। তারা (খাদেমদের কাছে) চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়। তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ (অর্থাৎ হুরগণ। হে মুসলমানগণ,) এরই (অর্থাৎ উল্লিখিত নিয়ামতসমূহেরই) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে হিসাব দিবসের জন্য। নিশ্চয় এটা আমার দান, যার কোন শেষ নেই। (অর্থাৎ চিরন্তন নিয়ামত।) এ তো হল, সৎ ও পরহিযগারদের বিষয়। (অতপর কাফিরদের সম্পর্কে কথা এই যে,) অবাধ্যদের জন্য (অর্থাৎ যারা কুফরীতে অন্যদের পথপ্রদর্শক ছিল, তাদের জন্য) রয়েছে মন্দ ঠিকানা তথা জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল। এটা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ; অতএব তারা তা আস্বাদান করুক! এ ছাড়া আরও এ ধরনের (অপ্রিয় ও কষ্টদায়ক) শাস্তি রয়েছে। (তাও আস্বাদন করুক। তাদের অনুসারীদের জন্যও এসব শাস্তি রয়েছে। তবে অগ্র-পশ্চাৎ এবং শক্ত ও শক্ততরে তফাৎ আছে। আমল ও আযাবে সবাই শরীক থাকবে। সেমতে কাফিরদের পথপ্রদর্শক প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, অতপর তাদের অনুসারীরা আগমন করবে। তখন পথপ্রদর্শকরা বলবেঃ) এই এক দল (তোমাদের সাথে আযাবে শরীক হওয়ার জন্য জাহান্নামে) প্রবেশ করছে। তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব---তারাও জাহান্নামেই প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ আযাবের যোগ্য নয়, এমন কেউ এলে তার আগমনে আনন্দবোধ করতাম এবং তাকে অভ্যর্থনা করতাম। এরা তো নিজেরাই জাহান্নামী, এদের কাছে কি আশা করা যায় এবং তাদের আগমনে আনন্দ কি ও অভ্যর্থনাই কি---) তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা তাদের পথপ্রদর্শকদেরকে) বলবে, তোমাদের উপরও আল্লাহ্‌র গযব কেননা, তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। (তোমরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে।) অতএব (জাহান্নাম) কত মন্দ আবাসস্থল! (যা তোমাদের কারণে আমাদের সামনে এসেছে। অতপর প্রত্যেকেই যখন একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে, তখন অনুসারীরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে) বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, সে আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা অথবা জাহান্নামের সবাই) বলবেঃ ব্যাপার কি, আমরা তাদেরকে (জাহান্নামে) দেখছি না, যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম! (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে বিপথগামী ও নিকৃষ্ট মনে করতাম, তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কেন?) আমরা কি (অহেতুক) তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, (ফলে তারা জাহান্নামে আসেনি---) না কি (জাহান্নামেই বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু) আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সাথে সাথে এ পরিতাপও করবে যে, যাদেরকে তারা মন্দ বলত; তারা আযাব থেকে বেঁচে গেছে।) এটা (অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা) অবশ্যম্ভাবী সত্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ—এর শাব্দিক অর্থ তাঁরা হস্ত ও দৃষ্টি বিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ ঃ ذِكْرَى الدَّارِ—শাব্দিক অর্থ গৃহের স্মরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। কোন কোন আল্লাহ্দ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তি-সমূহকে ভোঁতা করে দেয়।

হযরত আল ইয়াসা (আ) ঃ وَالْيَسَعَ [আল ইয়াসা (আ)-কে স্মরণ করুন।] হযরত আল ইয়াসা (আ) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানেও সূরা আন'আমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তা-রিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি, বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস (আ)-এর পর তাঁকেই নবুয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইলিশা ইবনে সাকেত' উল্লিখিত হয়েছে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ—(তাদের কাছে আনতনয়না সম-বয়স্কা রমণীগণ থাকবে।) অর্থাৎ জান্নাতের হুরগণ থাকবে। 'সমবয়স্কা'-এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে---সপত্নীসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলা বাহুল্য, এটা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তমঃ দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতূহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾
إِن يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي
خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا
لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ
بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن
نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ
عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ ۖ
وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ﴿٨٨﴾

(৬৫) বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী। (৬৭) বলুন, এটি এক মহা সংবাদ, (৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (৬৯) ঊর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। (৭০) আমার কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৭১) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৭২) যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো; (৭৩) অতপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সিজদায় নত হল, (৭৪) কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? (৭৬) সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন, মাটির দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। (৭৮) তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৭৯) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৮০) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেওয়া হল (৮১) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৮২) সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। (৮৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। (৮৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি—(৮৫) তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৮৬) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মাত্র। (৮৮) তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, (তোমরা যে রিসালত ও তওহীদ অস্বীকার করছ, এতে ক্ষতি তোমাদেরই, আমার নয়। কেননা,) আমি তো (আযাব থেকে তোমাদেরকে) সতর্ককারী (পয়গম্বর) মাত্র। (আমার রসূল ও সতর্ককারী হওয়া যেমন বাস্তব, তেমনি তওহীদও সত্য। অর্থাৎ) এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, (এবং পাপ) মার্জনাকারী। (যেহেতু তারা কোন না কোন পর্যায়ে তওহীদ মানলেও রিসালতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করত, তাই রিসালত সপ্রমাণ করার লক্ষ্যে বলা হচ্ছে, হে পয়গম্বর!) আপনি বলে দিন, এটা (অর্থাৎ তওহীদ ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে রসূল নিযুক্ত করা) এক বিরাট বিষয়

যা (অর্থাৎ যার প্রতি খুব যত্নবান হওয়া তোমাদের উচিত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এ) থেকে তোমরা (সম্পূর্ণভাবে) বিমুখ হয়ে আছ। (এতে বিশ্বাসী হওয়া ব্যতীত সত্যিকার সৌভাগ্য অর্জন অসম্ভব বিধায়) এটা বিরাট বিষয়। (অতপর রিসালত সপ্রমাণ করার একটি দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে,) ঊর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে (অর্থাৎ সেখানকার সে আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে) আমার (কোন উপায়ে) কোন জ্ঞানই ছিল না, যখন ফেরেশতারা (আদম সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে) কথাবার্তা বলছিল। (অথচ আমি এ ঘটনা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করছি। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আমি এ ঘটনা কোথা থেকে জানলাম, স্বচক্ষে তো দেখিনি? আহলে-কিতাব ইহুদী খৃস্টানদের সাথেও আমার তেমন মেলা-মেশা নেই যে, তাদের কাছ জেনে নেব। নিশ্চিতই এ জ্ঞান ওহীর মাধ্যমেই আমি পেয়েছি। সুতরাং প্রমাণিত হল যে,) আমার কাছে (যে) ওহী (আসে, যদ্দ্বারা ঊর্ধ্ব জগতের অবস্থাও জানা যায়, তা) শুধু এ কারণেই আসে যে, আমি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (অর্থাৎ আমি পয়গম্বরী পেয়েছি বিধায় আমার কাছে ওহী আসে। অতএব আমার রিসালত মেনে নেওয়া ওয়াজিব। আর ঊর্ধ্ব জগতের উল্লিখিত আলাপ-আলোচনা তখন হয়েছিল,) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতা-দেরকে বললেনঃ আমি মাটির দলা দ্বারা এক মানব (অর্থাৎ তার পুতুল) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে (অর্থাৎ তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে ফেলব এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো। বস্তুত (যখন আল্লাহ্ তাকে তৈরি করলেন, তখন) সমস্ত ফেরেশতা (আদমকে) সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস—সে অহংকারী হয়ে গেল এবং কাফিরে পরিণত হল। আল্লাহ্ বললেনঃ হে ইবলীস, আমি নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ যে বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার জন্য আল্লাহ্র বিশেষ দৃষ্টি ব্যয়িত হয়েছে, অতপর তাঁকে সিজদা করবার আদেশ করা হয়েছে) তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকারী হয়ে গেলে, না (বাস্তবে) তুমি উচ্চ মর্যাদাশীল (যে, তোমাকে সিজদার আদেশ করা শোভনীয় নয়)? সে বলল ঃ (দ্বিতীয় কথাটিই ঠিক। অর্থাৎ) আমি আদম থেকে উত্তম। কারণ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (সুতরাং তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়াটাই প্রজ্ঞা বিরুদ্ধ।) আল্লাহ্ বললেনঃ (তা হলে) তুই বেরিয়ে যা আকাশ থেকে। নিশ্চিতই তুই (এ কাজ করে) অভিশপ্ত। তোর প্রতি আমার অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। (এরপরে অনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা নেই।) সে বলল ঃ (আমাকে যদি আদমের কারণে অভিশপ্ত করে থাকেন, তবে আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) অবকাশ দিন (যাতে তার কাছ থেকে এবং তার সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে যথেষ্ট প্রতিশোধ নিতে পারি)। আল্লাহ্ বললেনঃ (তুই যখন অবকাশ চাস, তখন) তোকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। সে বলল ঃ (অবকাশ যখন পেলাম, তখন) আপনারই ইজ্জতের কসম, আমি সবাইকে বিপথগামী করে ছাড়ব, আপনার মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া। (অর্থাৎ আপনি যাদেরকে

আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন।) আল্লাহ্ বললেনঃ আমি সত্য বলি আর আমি তো (সর্বদা) সত্যই বলি, আমি তোর দ্বারা এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

[সূরার শুরু ভাগের আয়াতেই সুস্পষ্ট ছিল যে, এ সূরার মৌল উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত সপ্রমাণ করা। এর প্রমাণাদি সমাপ্ত হয়েছে। এখন উপদেশ দান প্রসঙ্গে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছেঃ] আপনি (শেষ প্রমাণ হিসাবে) বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ কোরআন প্রচারের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীও নই (যে, কৃত্রিমভাবে নবুয়ত দাবি করব এবং যা কোরআন নয়, তাকে কোরআন বলে দেব। অর্থাৎ মিথ্যা বললে তার কারণ হয় কোন বস্তুনিষ্ঠ উপকার হত, যেমন প্রতিদান, না হয় কোন স্বভাবগত অভ্যাস হত, যেমন কৃত্রিমতা। উভয়টিই নাই; বরং বাস্তবে) এটা (অর্থাৎ কোরআন আল্লাহ্র কালাম এবং) বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মাত্র। (এর প্রচারের জন্য আমি নবুয়ত পেয়েছি। এতে তোমাদেরই লাভ। কাজেই সত্য ফুটে উঠার পরও যদি তোমরা না মান, তবে) কিছুকাল পরে তোমরা এর অবস্থা অবশ্যই জানতে পারবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই বুঝতে পারবে যে, এটা সত্য ছিল এবং একে না মানা অন্যায় ছিল। কিন্তু তখন জানলেও কোন ফায়দা হবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার সার-সংক্ষেপ ঃ قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ—এ সূরার আসল লক্ষ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত প্রমাণ এবং কাফিরদের দাবি খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে—এক. রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মত আপনিও কাফিরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। দুই. এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গম্বরের রিসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মু'মিনদের শুভ পরিণতি ও কাফিরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অংকন করে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য-সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবি অর্থাৎ রিসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ---(ঊর্ধ্ব জগতের কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার রিসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিল, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ---আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে اخْتِصَام---বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ 'ঝগড়া করা' অথবা 'বাকবিতণ্ডা করা'। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اختصام শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত এ প্রশ্নোত্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ---(যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন---) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত আদম (আ)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।---(তফসীরে কবীর)

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ---এখানে আদম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন যে, আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আল্লাহ্র কুদরত। আরবী ভাষায় يد শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণত এক আয়াতে আছে بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ---অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি

আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহ্‌র কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর), সালেহ্ (আ)-এর উষ্ট্রীকে 'নাকাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী), ঈসা (আ)-কে কলেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র বাক্য) অথবা 'রুহুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র রূহ) বলা হয়েছে। এখানেও হযরত আদম (আ)-এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে।---(কুরতুবী)

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা ঃ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ---(আমি কৃত্রিমতা-শ্রয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রিসালত ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি না, বরং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সেমতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের একটি উক্তিও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

"লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে اللهُ أعلم (আল্লাহ্ ভাল জানেন) বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল সম্পর্কে বলেছেন ঃ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ---(রুহুল-মা'আনী)

سورة الزمر

সূরা যুমার

মক্কায় অবতীর্ণ, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝٢ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ
وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ
زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ
مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٤ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ
الْغَفَّارُ ۝٥ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ
لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا
مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝٦

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন। (৩) জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৪) আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ্, এক, পরাক্রমশালী। (৫) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (পরাক্রমশালী হওয়ার দাবি ছিল এই যে, কেউ এর প্রতি মিথ্যারোপ করলে তাকে অনতিবিলম্বে শাস্তি দেবেন; কিন্তু যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে এবং অবকাশ দানের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তাই শাস্তির ব্যাপারে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।) আমি যথাযথভাবে এ কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করেছি। অতএব আপনি (কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী) নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসসহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকুন (যেমন, এ পর্যন্ত করে এসেছেন। আপনার উপরও যখন তা ওয়াজিব, তখন অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না কেন? হে মানবকুল,) জেনে রাখ, (শিরক ও রিয়া থেকে) খাঁটি ইবাদত আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। যারা (খাঁটি ইবাদত ছেড়ে) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে (এবং বলে,) আমরা তো তাদের পূজা শুধু এ জন্যই করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয় (অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনাদি অথবা ইবাদত আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পেশ করে দেয়। যেমন, দুনিয়াতে মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ করে থাকে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের (এবং মু'মিনদের) মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের (কার্যত) ফয়সালা (কিয়ামতের দিন) করে দেবেন। (তওহীদপন্থীকে জান্নাতে এবং শিরকপন্থীকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। অর্থাৎ তারা না মানলে আপনি চিন্তাযুক্ত হবেন না, তাদের ফয়সালা সেখানে হবে। আপনি এতেও

আশ্চর্যান্বিত হবেন না যে, প্রমাণাদি সত্ত্বেও তারা সৎপথে আসছে না! কেননা) আল্লাহ্ তাকে সৎপথে আনেন না, যে (কথায়) মিথ্যাবাদী এবং (বিশ্বাসে) কাফির। (অর্থাৎ মুখে কুফরী কথাবার্তা এবং অন্তরে কুফরী বিশ্বাস রাখতে বদ্ধপরিকর ও সত্যান্বেষণে অনিচ্ছুক। তার এ হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে সৎপথের তওফীক দেন না। যেহেতু কোন কোন মুশরিক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে আখ্যা দিত, সুতরাং পরবর্তীতে তাদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে যে,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা (কাউকে সন্তান বানাতেন, তবে ইচ্ছা ব্যতীত যেহেতু কোন কিছু হয় না, তাই প্রথমে সন্তান করতে ইচ্ছা করতেন এবং যদি) কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে (আল্লাহ্ ব্যতীত সবই যেহেতু সৃষ্টি, তাই) অবশ্যই সৃষ্টির মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছা (এজন্য) মনোনীত করতেন। (এটা বাতিল। কেননা) তিনি (দোষত্রুটি থেকে) পবিত্র। (সৃষ্টির মধ্য থেকে সন্তান হওয়া দোষ। কাজেই সৃষ্টিকে সন্তান করা অসম্ভব। অসম্ভব কাজের ইচ্ছা করাও অসম্ভব। এভাবে প্রমাণিত হল যে,) তিনিই একক আল্লাহ্, (কার্যক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই এবং) পরাক্রমশালী। (সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও তার কোন শরীক নেই। কেননা তাঁর মতই পরাক্রমশালী কেউ থাকলে সম্ভাবনা থাকতে পারত, কিন্তু তা নেই। অতপর তওহীদের দলীল বর্ণিত হয়েছে---) তিনি (আসমান ও যমীনকে) যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রিকে (অর্থাৎ তার অন্ধকারকে) দিবসের উপর (অর্থাৎ তার আলোর উপর) আচ্ছাদিত করেন। (ফলে দিবস অদৃশ্য এবং রাত্রি দৃশ্য হয়ে যায়) এবং দিবসকে (অর্থাৎ তার আলোকে) রাত্রির উপর (অর্থাৎ তার অন্ধকারের উপর) তিনি আচ্ছাদিত করেন। (ফলে রাত্রি অদৃশ্য এবং দিবস দৃশ্য হয়।) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে। জেনে রাখ, (এসব প্রমাণের পর তওহীদ অস্বীকার করলে শাস্তির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দিতে সক্ষমও বটে। কেননা) তিনি পরাক্রমশালী, (কিন্তু অস্বীকারের পরেও স্বীকার করে নিলে অতীত অস্বীকারের কারণে শাস্তি হবে না। কেননা তিনি) ক্ষমাশীলও বটে। (এ বিবরণের মাধ্যমে তওহীদের প্রতি উৎসাহদান করা হল। উপরের প্রমাণগুলো ছিল প্রকৃতিগত। অতপর আত্মস্থিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু প্রাকৃতিক প্রমাণও এসে গেছে।) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ আদম থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকেই তার যুগল (অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের থেকে (সমস্ত মানুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।) তিনি তোমাদের (কল্যাণের) জন্য আট প্রকার (নর ও মাদী) চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। (অষ্টম পারায় এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো অধিক উপকারী বিধায় এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই দিগন্তস্থিত প্রমাণ যা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ব্যক্তিসত্তার স্থায়িত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ) তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন। (প্রথমে বীর্য, অতপর জমাট রক্ত, অতপর মাংসপিণ্ড এভাবে সৃষ্টিকার্য অব্যাহত থাকে। এই সৃষ্টি) তিন

অন্ধকারে সম্পন্ন হয়। (এক. পেটের অন্ধকার। দুই. গর্ভাশয়ের অন্ধকার এবং তিন. ভ্রূণকে জড়ানো ঝিল্লীর অন্ধকার। এসব পর্যায়ক্রমিক অবস্থা এবং একাধিক অন্ধকারে সৃষ্টি করা পরিপূর্ণ সক্ষমতা ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের দলীল।) তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। (এসব প্রমাণের পর সত্য থেকে) তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (তওহীদ কবুল করা এবং শিরক পরিত্যাগ করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

دين—فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ শব্দের অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খাঁটি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নামগন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতপর তিনি প্রমাণস্বরূপ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন।—(কুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহ্র নিকট আমল গৃহীত হয় ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্র কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়—ওজন দ্বারা হয়ে থাকে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ এবং উল্লিখিত আয়াত-সমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্র কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা, পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোন ইবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

যে সাহাবায়ে কিরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাঁদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

এ হল আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরিকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ তৈরি করল। অতপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি-বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, যাদের আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজদরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব মূর্তি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহ্র নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহ্র দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কোরআনী আয়াতের অর্থ তাই ঃ

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ -

তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল ঃ বর্তমান যুগের বস্তুবাদী কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্ন ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার

মালিক। আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুফর ও অকৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সুখ ও আরামের নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম রয়েছে, কিন্তু সুখ নেই। চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধিরও এত আধিক্য, যা পূর্বে কোনকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আরামের নব নব পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফিরের জন্যই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ অন্ধ অকৃতজ্ঞতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে বৈ কি। যে আল্লাহ্‌র দেওয়া উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা অন্ধ অকৃতজ্ঞতা নয় কি? د رمیاں خانۂ گم کردیم صاحب خانۂ را (আমরা গৃহাভ্যন্তরে গৃহ স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।)

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا--যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান হত, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা, জবরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অতএব তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ—تكوير অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। কোরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تكوير শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীলঃ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى--এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কোরআন পাক অথবা যে কোন আসমানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোন বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। বৈজ্ঞানিকদের

প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কোরআন পাকের তথ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

أَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ—আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিকে أنزل শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাযিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কোরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে—وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا——খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে—وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ——সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। —(কুরতুবী)

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ —এতে মানব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আল্লাহ্র কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্র কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেন নি, বরং خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা স্থাপন করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিল্পীর মত একাজ কোন খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না।

فتبارك الله احسن الخالقين

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِنْ
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ
إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ
لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(৭) যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। একের পাপভার অন্যে বহন করবে না। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত। (৮) যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। (৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (১০) বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে

সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুন্য। আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মানবকূল! তোমরা কুফর ও শিরকের অসারতা শুনলে, এরপর) যদি তোমরা কুফর কর, (শিরকও এর অন্তর্ভুক্ত) তবে (তাতে) আল্লাহ্ তা'আলা (কোন রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কেননা, তিনি) তোমাদের (এবং তোমাদের ইবাদতের) মুখাপেক্ষী নন। (তোমরা তওহীদ ও ইবাদত অবলম্বন না করলে তাঁর কোন ক্ষতি নেই। আর একথা অতি নিশ্চিত যে,) তিনি তাঁর বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। (কেননা এতে বান্দাদের ক্ষতি হয়।) যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, (যার প্রধান লক্ষণ হল ঈমান) তবে (তাতে) তার কোন লাভ নেই, কিন্তু যেহেতু এতে তোমাদের লাভ হয়, (তাই) তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। (যেহেতু আমার নীতি এই যে,) একের পাপভার অন্যে বহন করবে না, (তাই কুফর করে এরূপ মনে করো না যে, তোমার কুফর অপরের আমলনামায় কোন কারণে লিখিত হয়ে যাবে এবং তুমি নির্দোষ হয়ে যাবে। যেমন, অপরের অনুসারী হওয়ার কারণে অথবা অপরে তা বহন করার ওয়াদা করার কারণে। কোন কোন লোক বলত ঃ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ —মোটকথা, এরূপ হবে না বরং তোমার কুফর তোমার আমলনামায়ই লেখা হবে।) অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। (এবং শাস্তি দিবেন। সুতরাং কিয়ামত হবে না বলে তোমাদের ধারণাও ভ্রান্ত।) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং এরূপ ধারণাও মিথ্যা যে, তিনি হয়তো তোমাদের কুফর সম্পর্কে অবগত নন। হাদীসে আছে কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ আলোচনা হয় যে, জানি না আল্লাহ্ আমাদের কথাবার্তা শুনেন কিনা। অতপর এ সম্পর্কে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করে। এরই প্রেক্ষিতে وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ— ---আয়াত নাযিল হয়।) যখন (মুশরিক) লোকদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তার (সত্যিকার) পালনকর্তাকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে (এবং অন্য সব উপাস্যকে ভুলে যায়।) অতপর যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত (শান্তি ও সুখ) দান করেন, তখন সে কষ্টের বিষয় ভুলে যায়, যার (অর্থাৎ যা অপসারিত করার) জন্যই পূর্বে (আল্লাহ্‌কে) ডেকেছিল এবং আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে, যাতে (নিজে তো বিভ্রান্ত আছেই, এছাড়া) অপরকেও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। (সে যদি পূর্বের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত না হত, তবে খাঁটি তওহীদপন্থী হয়ে যেত। এ হল মুশরিকের নিন্দা। অতপর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে ঃ) আপনি (এ ধরনের লোকদেরকে) বলে দিন, তুমি তোমার কুফরের স্বাদ কিছুকাল ভোগ করে নাও। (অতপর নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতপর তওহীদ পন্থীদের প্রশংসা করে

সুসংবাদ দেওয়া হয়েছেঃ) যে ব্যক্তি (উপরোক্ত মুশরিকের বিপরীতে) রাত্রিকালে (যা সাধারণত গাফলতির সময়) সিজদা ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ নামাযরত) অবস্থায় ইবাদত করে (এবং অন্তরে) পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, (এমন ব্যক্তিও উপরোক্ত মুশরিকদের সমান হতে পারে কি? কখনও নয়। বরং 'কানেত' তথা নিয়মিত ইবাদতকারী এবং আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে এবং তার কাছ থেকেই রহমত প্রত্যাশা করে সে প্রশংসার যোগ্য। পক্ষান্তরে যে মুশরিক স্বার্থ উদ্ধারের পর নিষ্ঠা পরিহার করে সে নিন্দার যোগ্য। আর যেহেতু এভাবে ইবাদত পরিহার করাকে কাফিররা নিন্দনীয় বলে মনে করত না, তাই এ পার্থক্যের কারণে প্রশংসা ও নিন্দার হুকুম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হতে পারত। কাজেই পরবর্তীতে অধিকতর প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, হে পয়গম্বর!) আপনি (তাদেরকে এভাবে) বলে দিন যে, জ্ঞানী ও মূর্খ কি সমান হতে পারে? (মূর্খতাকে যেহেতু সবাই নিন্দনীয় মনে করে, তাই এর উত্তরে তারা বলবে, যে জানে না, সে নিন্দার্হ। যদিও এ বর্ণনা থেকে কুফর ও কাফিরের নিন্দার যোগ্য হওয়া এবং ঈমান ও মু'মিনের প্রশংসার যোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তথাপি) উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা (সুস্থ) বুদ্ধির অধিকারী। (অতএব, আপনি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মু'মিনদেরকে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (অর্থাৎ সদাসর্বদা তাঁর আনুগত্য কর এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক। এগুলো আল্লাহ্‌ ভীতির শাখা। অতপর এর ফলাফল বর্ণিত হয়েছেঃ) যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। (পরকালে তো অবশ্যই, আন্তরিক সুখ অনিবার্য এবং কখনও বাহ্যিক সুখও।) নিজ দেশে সৎকাজ করার পথে বাধা থাকলে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাও। (কেননা,) আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুবিস্তীর্ণ। (যদি দেশ ত্যাগে কষ্ট অনুভব কর, তবুও অন্তরে দৃঢ়তা পোষণ কর। কেননা, ধর্মের কাজে) দৃঢ়তা পোষণকারীরা তাদের পুরস্কার পাবে অগণিত। (এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ—অর্থাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ—অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رضاء শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে

কোন কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سخط শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোন কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জমা'আতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নভভী 'উসুল ও যাওয়াবেত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

مذهب اهل الحق الايمان بالقدر و اثباته وان جميع الكائنات خيرها و شرها بقضاء الله و قدره و هو مريدلها كلها و يكره المعاصى مع انه تعالى مريد لها لحكمة يعلمها - جل و علا -

সত্যপন্থীদের মযহাব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভাল-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্র আদেশ ও তকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোন উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনিই জানেন। ---(রূহুল মা'আনী)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ—এই বাক্যের পূর্বে কাফিরদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এর পর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে أَمَّنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ কাফিরকে বলা হবে---তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قَانِتٌ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ—তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাযে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।---(কুরতুবী)

اناء الليل—এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ্ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও اناءالليل বলেছেন।—(কুরতুবী)

وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ—এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ্র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশে থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ—بغير حساب—অর্থ সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়—অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ بغير حساب—এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে দাবি ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওযন করে সে হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতপর বালা-মুসিবতে সবর-কারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওযন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ —ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে—হায়, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।